

118

119

三

三

三

三

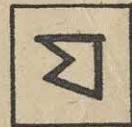
6899



५८  
६८९९



6899

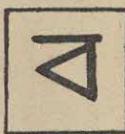


~~6899~~

~~6899~~



# সুকুমার রায়



সিগনেট প্রেস ।। কলকাতা ২০

বিভাগ সিগনেট সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৫৯

প্রকাশক

দিলীপকুমার ঘুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০১২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

নামপত্র

মত্তাজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীর্গোরাচন্দ্র প্রেস

৫ চিন্নামনি দাম লেন

অঙ্কনগঠ মুদ্রক

গদেন এও কোম্পানি

৭১১ প্রাট লেন

বাধিয়েছেন

বাসন্তী বাইঙ্গ ওয়ার্কস

৬১১ বির্জিপুর স্ট্রীট

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

দাম একটাকা চারআন।

23.2.94

7880

শ

ঘ

ব

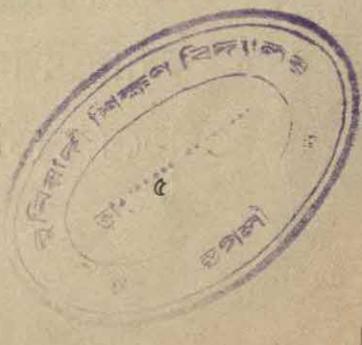
ৰ

ল্প

বেজায় গরম। গাছতলায় দিবি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্তির।  
ঘাসের উপর রূমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি  
রূমালটা বলল, ‘ম্যাও !’

কি আপদ ! রূমালটা ম্যাও করে কেন ?

চেয়ে দেখি রূমাল তো আর রূমাল নেই, দিবি মোটা-সেটা লাল টক্টকে একটা  
বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট্-প্যাট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।  
আমি বললাম, ‘কি মুশকিল ! ছিল রূমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল !’





বেড়াল বলল, ‘বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।’  
আমি বললাম, ‘চন্দ্রবিন্দু কেন?’

শুনে বেড়ালটা ‘তাও জানো না?’ বলে এক চোখ বুজে ফ্যাচ-ফ্যাচ করে বিশ্রী রকম  
৬

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, ‘মুশকিল  
আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে  
গেল দিবি একটা পঁ্যাকপেঁকে হাস।  
এ তো হামেশাই হচ্ছে।’

আমি খানিক ভেবে বললাম, ‘তাহলে  
তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি  
তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে  
তুমি হচ্ছ রুমাল।’

হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, এই চন্দ্রবিন্দুর কথাটা  
নিশ্চয় আমার বোকা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম,  
‘ও ইঁয়া-ইঁয়া, বুঝতে পেরেছি।’

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, ‘ইঁয়া, এ তো বোকাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের  
তালব্য শ, রূমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?’

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রি  
করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে-সঙ্গে হ্রে-হ্রে করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ  
আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাতে বলে উঠল, ‘গরম লাগে তো তিবত গেলেই পার।’  
আমি বললাম, ‘বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?’

বেড়াল বলল, ‘কেন? সে আর মুশকিল কি?’

আমি বললাম, ‘কি করে যেতে হয় তুমি জানো?’

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, ‘তা আর জানিনে ? কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার,  
রানাঘাট, তিৰত, ব্যাস ! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘটার পথ, গেলেই হল ।’

আমি বললাম, ‘তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার ?’

শুনে বেড়ালটা হঠাতে কেমন গন্তীর হয়ে গেল । তারপর মাথা নেড়ে বলল, ‘উঁহ,  
সে আমার কর্ম নয় । আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তাহলে সে ঠিক-ঠিক বলতে  
পারত ।’

আমি বললাম, ‘গেছোদাদা কে ? তিনি থাকেন কোথায় ?’

বেড়াল বলল, ‘গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে ? গাছেই থাকে ।’

আমি বললাম, ‘কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ?’

বেড়াল খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, ‘সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই ।’

আমি বললাম, ‘কি রকম ?’

বেড়াল বলল, ‘সে কি রকম জানো? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে  
দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে  
তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার।  
কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।’

আমি বললাম, ‘তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?’

বেড়াল বলল, ‘সে অনেক হাঙামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায়  
কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে  
পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে,  
সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে।  
তারপর দেখতে হবে—’

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, ‘সে কি রকম হিসেব?’

বেড়াল বলল, ‘সে ভারি শক্তি। দেখবে কি রকম?’ এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে  
ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, ‘এই মনে কর গেছোদাদা।’ বলেই খানিকক্ষণ  
গন্তীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, ‘এই মনে কর তুমি,’ বলে  
ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাতে আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, ‘এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।’ এমনি  
করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, ‘এই  
মনে কর তিরিত’—‘এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে’—‘এই মনে কর গাছের  
গায়ে একটা ফুটো—’

এই রকম শুনতে-শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম,  
‘দূর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছে, একটুও ভালো লাগে না।’

বেড়াল বলল, ‘আচ্ছা, তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি  
যা বলব, মনে-মনে তার হিসেব কর।’ আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাঁড়া-শব্দ নেই। হঠাতে  
কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া  
টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন  
ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মোটা গলায় বলে উঠল, ‘সাত দুগুণে কত হয়?’

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার  
সেই আওয়াজ হল, ‘কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?’ তখন উপর  
দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখচ্ছে, আর  
এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, ‘সাত দুগ্ধে চোদ্দ।’

কাকটা অমনি দুলে-দুলে মাথা নেড়ে বলল, ‘হয়নি, হয়নি, ফেল।’

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, ‘নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্ষে সাত, সাত দুগ্ধে চোদ্দ, তিন সাতে একুশ।’

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, ‘সাত দুগ্ধে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।’

আমি বললাম, ‘তবে যে বলছিলে সাত দুগ্ধে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?’

কাক বলল, ‘তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।’

আমি বললাম, ‘এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগ্ধে যদি চোদ্দ

হয়, তা সে সব সময়েই চোদ।

একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশদিন  
পরে হলেও তাই।'

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল,  
'তোমাদের দেশে সময়ের দাম  
নেই বুঝি ?'

আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি  
রকম ?'

কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে,  
তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে  
সময় এখন ভয়ানক মাণি, এতটুকু



বাজে খরচ করবার যো নেই। এইতো কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটে  
সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।' বলে  
সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময়ে হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা স্ফুরণ করে পিছলিয়ে  
মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের  
দাঢ়ি, হাতে একটা হঁকো তাতে কলকে-টলকে কিছু নেই, আর মাথা ভরা টাক।  
টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিগগেস করল, 'কই,  
হিসেবটা হল ?'

কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।'

বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য ! উনিশদিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না ?'

কাক দু-চার মিনিট খুব গন্তীর হয়ে  
পেনসিল চুবল, তারপর জিগগেস করল,  
'কতদিন বললে ?'  
বুড়ো বলল, 'উনিশ।'  
কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল,  
'লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি।'  
বুড়ো বলল, 'একুশ।' কাক বলল 'বাইশ।'  
বুড়ো বলল, 'তেইশ।' কাক বলল, 'সাড়ে  
তেইশ।' ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।  
ডাকতে-ডাকতে কাকটা হঠাত আমার  
দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে ?'



আমি বললাম, ‘খামকা ডাকতে যাব কেন?’

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখেনি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন্বন্ করে আঁট দশ পাকু ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তারপর হঁকেটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার-বার দেখতে লাগল। তারপর কোথেকে একটা পুরানো দরজীর ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর ইঁকতে লাগল, ‘খাড়াই ছাবিশ ইঞ্চি, হাতা ছাবিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাবিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাবিশ ইঞ্চি, গলা ছাবিশ ইঞ্চি।’ আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, ‘এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাবিশ ইঞ্চি, গলাও ছাবিশ ইঞ্চি? আমি কি শুণোর?’

বুড়ো বলল, ‘বিশ্বাস না হয়, দেখ।’

দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে,  
তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাবিশ ইঞ্জিং হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিগগেস করল, ‘ওজন কত?’

আমি বললাম, ‘জানিনা।’

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে-টিপে বলল, ‘আড়াই সের।’

আমি বললাম, ‘সেকি, পট্টার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড়  
বছরের ছোট।’

কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘সে তোমাদের হিসেব অন্য রকম।’

বুড়ো বলল, ‘তাহলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।’

আমি বললাম, ‘দৃঢ় ! আমার বয়স হল আট বছর তিনমাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।’

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিগগেস করল, ‘বাড়তি না কমতি?’

আমি বললাম, ‘সে আবার কি ?’

বুড়ো বলল, ‘বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে ?’

আমি বললাম, ‘বয়েস আবার কমবে কি ?’

বুড়ো বলল, ‘তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি ? তাহলেই তো গেছি !  
কোনদিন’ দেখবো বয়েস বাড়তে-বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে  
গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি !’

আমি বললাম, ‘তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না !’

বুড়ো বলল, ‘তোমার যেমন বুদ্ধি ! আশি বছর বয়েস হবে কেন ? চলিশ বছর হলেই  
আমরা বয়েস ঘূরিয়ে দিই। তখন আর একচলিশ বেয়ালিশ হয় না—উনচলিশ,  
আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত  
নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল

আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।’ শুনে আমার ভয়ানক হাসি  
পেয়ে গেল।

কাক বলল, ‘তোমরা একটু আন্তে-আন্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চঠিপট  
দেরেনি।’

বুড়ো অমনি চাই করে আমার পাশে এসে ঠাং ঝুলিয়ে বসে ফিস্ফিস্ করে বলতে  
লাগল, ‘একটি চমৎকার গৰ্প বলব। দাঢ়াও একটু ভেবেনি।’ এই বলে তার হাঁকে  
দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে-চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাং  
বলে উঠল, ‘হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—

‘তারপর এদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিস্বত্তে খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিছু  
জানে না। ওদিকে রাঙ্কসটা করেছে কি, ঘুমুতে-ঘুমুতে ইঁড়ি-ঝঁড়ি-কঁড়ি, মানুষের

গন্ধ পাঁট বলে হড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই  
কাঁশি লোক লঙ্কর সেপাই পষ্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার-মার কাট-কাট—এর মধ্যে  
হঠাতে রাজা বলে উঠলেন, পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ঘাজ নাই কেন? শুনে পাত্র  
মিত্র ডাক্তার মোক্তার আকেল মকেল সবাই বললে, ভালো কথা! ঘাজ কি  
হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব স্বৰ্স্বর করে পালাতে লাগল।’

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল, ‘বিজ্ঞাপন পেয়েছ?  
হাণ্ডিল ?’

আমি বললাম, ‘কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?’ বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণিল  
থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল, আমি পড়ে দেখলাম  
তাতে লেখা রয়েছে—

১২  
১৭



শ্রীশ্রীভূষণকাঁগায় নমঃ

6899

# শ্রীকাকেশ্বর কুচ্কুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাশেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচু ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি।  
মূল্য এক ইঞ্চি ১/- CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ,  
কান কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যিকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান !      সাবধান !!      সাবধান !!!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঙ্গিকুলীন, অর্থাৎ দাঢ়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেডেকাক, রামকাক প্রভৃতি  
কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান ! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

পৃষ্ঠা ১৩৩  
২৩.২.৭৫  
৭৮৮০



কাক বলল, ‘কেমন হয়েছে?’

আমি বললাম, ‘সবটাতো ভালো করে বোঝা গেল না।’

কাক গন্তীর হয়ে বিলল, ‘ইঁয়া, ভারি শক্তি, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল তার ছিল টেকো মাথা—’

এই কথা বলতেই বুড়ো মাং-মাং করে তেড়ে উঠে বলল, ‘দেখ! ফের যদি টেকো মাথা টেকো মাথা বলবি তো হঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্বেট ফাটিয়ে দেবো।’

কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, ‘টেকো নয়, টেপো মাথা, যে মাথা টিপে-টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।’

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে-বসে গজ্জগজ্জ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, ‘হিসেবটা দেখবে নাকি?’

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, ‘হয়ে গেছে? কই দেখি।’

কাক অমনি ‘এই দেখ’ বলে তার শ্লেষ্টখানা ঠকাস্ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোট ফুলিয়ে ‘ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা’ বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, ‘লাগল নাকি! ষাট-ষাট।’

বুড়ো অমনি কাঙ্গা থামিয়ে বলল, ‘একষটি, বাষটি, চৌষটি—’

কাক বলল, ‘পঁয়ষটি।’

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ‘কই হিসেবটা তো দেখলে না?’

বুড়ো বলল, ‘ইং-ইং তাইতো! কি হিসেব হল পড় দেখি।’

আমি শ্লেষ্টখানা তুলে দেখলাম খুদে-খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—

‘ইয়াদি কিদ্বি অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারং  
খেসারং দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বে অত্র নায়েব  
সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্রনৌ পাট্টা অথবা কাওলা করুলিযং। সত্যতায়  
কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপার্দ আসামী ফরিয়াদী  
সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকদ্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম  
ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—’

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, ‘এসব কি লিখেছ আবোল-তাবোল ?’  
কাক বলল, ‘ওসব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকিবে কেন ? ঠিক চৌকসমতো  
কাজ করতে হলে গোড়ায় এসব বলে নিতে হয়।’

বুড়ো বলল, ‘তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না ?’  
কাক বলল, ‘হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে, শেষ দিকটা পড় তো ?’

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা-মোটা অঙ্করে লেখা রয়েছে—

সাত দুগ্ধে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্জি, জমা /১। সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, ‘দেখেই বোৰা যাচ্ছে অঙ্কটা এল-সি-এম্প নয়, জি-সি-এম্প নয়। সুতৰাং হয় এটা ত্ৰৈৱাশিকেৰ অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পৱীক্ষা কৱে দেখলাম আড়াই সেৱটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তাহলে বাকি তিনটে হল ত্ৰৈৱাশিক। এখন আমাৰ জানা দৱকাৱ, তোমৰা ত্ৰৈৱাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?’

বুড়ো বলল, ‘আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবাৱ জিগগেস কৱে নি।’ এই বলে সে নিচু হয়ে গাছেৰ গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, ‘ওৱে বুধো ! বুধো রে !’

খানিক পৱে মনে হল কে যেন গাছেৰ ভিতৰ থেকে রেগে বলে উঠল, ‘কেন ডাকছিস ?’

বুড়ো বলল, ‘কাকেশ্বৰ কি বলছে শোন।’

আবার সেই রকম আওয়াজ হল, ‘কি বলছে ?’

বুড়ো বলল, ‘বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ ?’

তেড়ে উত্তর হল, ‘কাকে বলছে ভগ্নাংশ ? তোকে না আমাকে ?’

বুড়ো বলল, ‘তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক ?’

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, ‘আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল !’

বুড়ো গষ্টৌরভাবে খানিকক্ষণ দাঢ়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, ‘বুধোটার  
যেমন বুদ্ধি ! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন ? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে ? না হে  
কাকেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও !’

কাক বলল, ‘তাহলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ দিলে রইল ভগ্নাংশ  
আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে—খাটি  
হলে দু টাঙ্কা। চোদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।’

বুড়ো বলল, ‘আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফেঁটা জল হিসেবের মধ্যে  
পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেষ্ট, আর এই নাও পয়সা ছটা।’

পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফুর্তি ! সে ‘টাক্-ডুমাডুম্ টাক্-ডুমাডুম্’ বলে শ্লেষ্ট বাজিয়ে  
নাচতে লাগল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, ‘ফের টাক-টাক বলছিস ? দাঁড়া। ওরে বুধো, বুধো  
রে ! শিগগির আয়। আবার টাক বলছে।’ বলতে-না-বলতেই গাছের ফোকর থেকে  
মন্ত একটা পেঁটলা মতন কি যেন হড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে  
দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ বেঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে  
হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হঁকো-  
ওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে, না সে নিজেই পেঁটলার উপর চড়ে বসে,  
‘ওঠ, বলছি, শিগগির ওঠ্’ বলে ধাঁই-ধাঁই করে তাকে হঁকো দিয়ে মারতে লাগল।

କାକ ଆମାର ଦିକେ ଚୋଖ ଘଟକିଯେ ବଲଲ, ‘ବ୍ୟାପାରଟୀ ବୁଝାତେ ପାରଛ ନା? ଉଧୋର ବୋକା ବୁଧୋର ସାଡେ । ଏଇ ବୋକା ଓର ସାଡେ ଚାପିଯେ ଦିଯେଛେ, ଏଥିନ ଓ ଆର ବୋକା ଛାଡ଼ିତେ ଚାଇବେ କେନ? ଏହି ନିଯେ ରୋଜ ମାରାମାରି ହୟ ।’

ଏହି କଥା ବଲତେ-ବଲତେଇ ଚେଯେ ଦେଖି, ବୁଧୋ ତାର ପୋଟିଲା ଶୁଣ୍ଡ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛେ । ଦାଁଡ଼ିଯେଇଁ ସେ ପୋଟିଲା ଉଂଚିଯେ ଦାଁତ କଡ଼ମଡ଼ କରେ ବଲଲ, ‘ତବେ ରେ ଇସ୍ଟୁପିଡ ଉଧୋ! ଉଧୋଓ ଆସିନ ଗୁଟିଯେ ହଁକେ! ବାଗିଯେ ହଂକାର ଦିଯେ ଉଠିଲ, ‘ତବେ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛାଡ଼ା ବୁଧୋ !’

କାକ ବଲଲ, ‘ଲେଗେ ଯା, ଲେଗେ ଯା—ନାରଦ-ନାରଦ !’

ଅମନି ଝାଟାପଟ, ଖଟାଖଟ, ଦମାଦମ, ଧପାଧପ! ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଚେଯେ ଦେଖି ଉଧୋ ଚିତପାତ ଶୁଯେ ହାଁପାଛେ, ଆର ବୁଧୋ ଛଟ୍ଟଫଟ୍ କରେ ଟାକେ ହାତ ବୁଲୋଛେ ।

ବୁଧୋ କାନ୍ନା ଶୁରୁ କରଲ, ‘ଓରେ ଭାଇ ଉଧୋ ରେ, ତୁଟେ ଏଥିନ କୋଥାଯ ଗେଲି ରେ ?’

উধো কাঁদতে লাগল, ‘ওরে হায় হায় ! আমাদের বুধোর কি হল রে !’

তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি  
করে, দিবি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে  
কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ভাবছি এই বেলা পথ  
খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন  
সময় শুনি পাশেই একটা  
বোপের মধ্যে কি রকম শব্দ  
হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে-  
হাসতে আর কিছুতেই হাসি  
সামলাতে পারছে না। উঁকি



মেরে দেখি, একটা জন্ম—মানুষ না বাঁদর, পঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—  
খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, ‘এই গেল গেল—নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে  
গেল !’

হঠাতে আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, ‘ভাগিয়স তুমি এসে পড়লে,  
তা না ইলে আর একটু হলেই হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।’

আমি বললাম, ‘তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন ?’

জন্মটা বলল, ‘কেন হাসছি শুনবে ? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হত, আর সব  
জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘূলিয়ে প্যাচ-প্যাচ কানা  
হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে—  
হোঁ হোঁ হোঁ—’ এই বলে সে আবার হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, ‘কি আশ্চর্য ! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ ?’

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, ‘না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন  
লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি বরফ আর হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা  
কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঁ হোঁ হো, হাঃ  
হাঃ হাঃ হা—’ আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, ‘কেন তুমি এই সব অসন্তুষ্ট কথা ভেবে খামখা হেসে-হেসে কষ্ট  
পাচ্ছ ?’

সে বলল, ‘না, না, সব কি আর অসন্তুষ্ট ? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি  
পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল  
এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে—হোঁ হোঁ হোঁ হো—’

জন্মটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অঙ্গুত লাগল। আমি জিগগেস করলাম,  
‘তুমি কে ? তোমার নাম কি ?’

সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, ‘আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্। আমার নাম হিজি বিজ্  
বিজ্, আমার ভায়ের নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার বাবার নাম হিজি বিজ্ বিজ্,  
আমার পিশের নাম হিজি বিজ্ বিজ্—’

আমি বললাম, ‘তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিশুন্দ সবাই হিজি  
বিজ্ বিজ্।’

সে আবার খানিক ভেবে বলল, ‘তাতো নয়, আমার নাম তকাই। আমার মামার  
নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার  
শ্বশুরের নাম তকাই—’

আমি ধমক দিয়ে বললাম, ‘সত্যি বলছ? না, বানিয়ে?’

জন্মটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, ‘না, না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।’

আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, ‘একটা কথাও বিশ্বাস করি না।’

অমনি কথা নেই বার্তা নেই,  
বোপের আড়াল থেকে মন্ত্র  
একটা দাড়িওয়ালা ছাগল  
হঠাতে উঁকি মেরে জিগগেস  
করল, ‘আমার কথা হচ্ছে  
বুবি?’

আমি বলতে যাচ্ছিলাম ‘না’  
কিন্তু কিছু না-বলতেই তড়তড়  
করে সে বলে যেতে লাগল,  
‘তা তোমরা যতই তর্ক কর,  
এমন অনেক জিনিস আছে



যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—  
ছাগলে কি না খায়।' এই বলে সে হঠাতে এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—  
'হে বালকবন্দ এবং 'ম্মেহের হিজ্ বিজ্ বিজ্, আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট  
দেখেই বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি. এ. খাত্তবিশারদ।  
আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো  
দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা। কোন-কোন  
জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা-কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে  
পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাত্তবিশারদ। তোমরা যে বলো—  
পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়—এটা অত্যন্ত অন্যায়। এইতো একটু  
আগে ঐ হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা একেবারে সম্পূর্ণ  
মিথ্যা কথা। আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিছু

নেই। অবিশ্বি আমরা মাঝে-মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না,  
যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিঞ্চিৎ নারকেলের ছোবরা, কিঞ্চিৎ খবরের কাগজ, কিঞ্চিৎ  
সন্দেশের মতো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো  
বই আমরা কক্ষনো খাই না। আমরা কচিং কখনো লেপ কম্বল কিঞ্চিৎ তোশক  
বালিশ এসব একটু-আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিঞ্চিৎ টেবিল  
চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে,  
তখন শখ করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিঞ্চিৎ চেখে দেখি, যেমন,  
পেনসিল রবার কিঞ্চিৎ বোতলের ছিপি কিঞ্চিৎ শুকনো জুতো কিঞ্চিৎ ক্যামবিসের ব্যাগ।  
শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার ফুর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তারু  
প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিঞ্চিৎ শিশি বোতল, এ  
সব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ-কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সে

সব নেহাত ছোটখাটি বাজে সাবান। আমার ছোটভাই একটা আন্ত বার-সোপ  
খেয়ে ফেলেছিল—' বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা-ব্যা করে  
ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির  
অকালমৃত্যু হয়েছে।

হিজি বিজ্জি বিজ্ঞা এতক্ষণ পড়ে-পড়ে ঘুমোছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কাঙা  
শুনে সে ইউ-মাউ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্তির!  
আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার! কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার  
তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে হাসতে লেগেছে।

আমি বললাম, 'এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল ?'

সে বলল, 'সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে-মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকাতো  
যে সবাই তার উপর চট্টা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি

সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে  
লেগেছে—হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ—  
আমি বললাম, ‘যত সব বাজে কথা।’  
এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি  
চেয়ে দেখি একটা নেড়ামাথা কে-যেন  
যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর  
পায়জামা পরে হাসি-হাসি মুখ করে  
আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে  
আমার গা জলে গেল। আমায়  
ফিরতে দেখেই সে আবদার করে  
আঙ্গুলীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত



নেড়ে বলতে লাগল, ‘না ভাই, এখন আমায় গাইতে বল না। সত্তি বলছি,  
আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।’

আমি বললাগ, ‘কি আপদ ! কে তোমায় গাইতে বলছে ?’

লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান্ করতে লাগল,  
‘রাগ করলে ? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে ? আচ্ছা, না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি,  
রাগ করবার দরকার কি ভাই ?’

আমি কিছু বলবার আগেই ছাগুলটা আর হিজি বিজি বিজিটা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে  
উঠল, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।’ অঘনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত  
হই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে-করতে  
হঠাৎ সরু গলায় চীৎকার করে গান ধরল—‘লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ।’  
ঐ একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দুবার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।

আমি বললাম, ‘এতো ভাৰি উৎপাত দেখছি, গানেৱ কি আৱ কোনো পদ নেই?’  
নেড়া বলল, ‘হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—অলিগলি  
চলি রাম, ফুটপাথে ধূমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম। সে গান আজকাল আমি গাই  
না। আৱেকটা গান আছে—নাইনিতালেৱ নতুন আলু—সেটা খুব নৱম স্বরে গাইতে  
হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পাৱি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে  
শিখিপাখাৱ গান।’ এই বলেই সে গান ধৰল—

শিশিমাখা শিখিপাখা আকাশেৱ কানে কানে  
শিশিবোতল ছিপিচাকা সৱু সৱু গানে গানে  
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদুৱে,  
সৱু মোটা শাদা কালো ছলছল ছায়াস্বৱে।

আমি বললাম, ‘এ আবাৱ গান হল নাকি? এৱ তো মাথামুণ্ডু কোনো মানেই হয়না।’

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, ‘ইঁয়া, গান্টা ভারি শক্ত ।’

ছাগল বলল, ‘শক্ত আবার কোথায় ? এ শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত  
ঠেকল, তাছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না ।’

নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, ‘তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো দে  
কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি ? আমি কি আর সহজ গান  
গাইতে পারি না ?’ এই বলে সে গান ধরল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,  
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু ।

আমি বললাম, ‘মজারু বলে কোনো একটা কথা হয় না ।’

নেড়া বলল, ‘কেন হবে না—আলবত হয়। সজারু কাঞ্চারু দেবদারু সব হতে পারে,  
মজারু কেন হবে না ?’

ছাগল বলল, ‘ততক্ষণ গানটা চলুক না, হয় কি না-হয় পরে দেখা যাবে।’ অমনি

আবার গান শুরু হল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,  
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।  
আজকে হেথোয় চামচিকে আর পেঁচার।  
আসবে সবাই, মরবে ইদুর বেচার।  
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,  
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,  
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,  
দেখবে তখন ছিসি ছ্যাঙ্গা চপাটি।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলতে লাগল—

সজারু কয়, বোপের মাঝে এখনি  
গিন্নী আমার ঘূম দিয়েছেন দেখনি ?  
জেনে রাখুন পঁচা' এবং পঁচানী,  
ভাঙলে সে ঘূম শুনে তাদের চ্যাচানি,  
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—  
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।

বাহুড় বলে, পেঁচার কুটুম্ব কুটুম্বী  
মানবে না কেউ তোমার এসব ঘুঁতুমি।  
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আধারে ?  
গিন্নী তোমার হঁতলা এবং হাঁদাড়ে।  
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে  
চিমনি-চাটা ভঁগসা-মুখো ভ্যাপাটে।

গান্টা আরও চলত কিনা জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল  
শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, আমার আশেপাশে চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছে।  
একটা সজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শাম্লাপরা কুমির  
মন্ত একটা বই দিয়ে আস্তে-আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে আর ফিস্ফিস্ করে বলছে,

‘কেঁদো না, কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।’ হঠাতে একটা তকমা-আঁটা পাগড়ি-  
বাঁধা কোলাব্যাঙ্গ রংল উঁচিরে চীৎকার করে বলে উঠল—‘মানহানির মোকদ্দমা।’

অমনি কোথেকে একটা কালো ঘোললা-পরা হতোয় পঁ্যাচা এসে সকলের সামনে  
একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে তুলতে লাগল, আর একটা মন্ত্র ছুঁচে  
একটা বিশ্বি নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

পঁ্যাচা একবার ঘোলা-ঘোলা চোখ করে চারদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ  
বুজে বলল, ‘নালিশ বাতলাও।’

বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো-কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে  
খিমচিয়ে পাঁচ ছয় ফেঁটা জল বার করে ফেলল। তারপর সর্দিবসা মোটা গলায়  
বলতে লাগল, ‘ধর্মাবতার হজুর! এটা মানহানির মোকদ্দমা। স্বতরাং প্রথমেই  
বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু

অনেক প্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কন্দাকচু, মুখিকচু, পানিকচু, শঞ্জকচু, ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।’

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শাম্ভল মাথায় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলল, ‘হজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুটকুট করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুণুর আর সজারু। ওয়াক্ থুঃ।’ সজারুটা আবার ফ্যাঙ্ফ্যাঙ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিগগেস করল, ‘দলিলপত্র সাক্ষী-টাক্ষী কিছু আছে?’ সজারু ঘ্যাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঐ তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।’ বলতেই কুমিরটা ঘ্যাড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

একের পিঠে দুই

গোলাপ চাপা জুই

সান্ বাঁধানো তুই

চোকি চেপে শুই

ইলিশ মাঞ্চর রুই

গোবর জলে ধুই

পেঁটলা বেঁধে থুই

হিন্টে পালং পুই

কাদিম কেন তুই?

সজারু বলল, ‘আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়।’ কুমির বলল, ‘তাই নাকি?  
আছা, দাঢ়াও।’ এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—  
ঠান্ডনি রাতের পেতনীপিসি সজনেতলায় খোঁজনা রে—

থ্যাতলা মাথা হাঁলা সেথা হাড় কচাকচ ভোজ মারে।

চালতা গাছে আল্তা পরা নাক ঝুলানো শাঁখচুনি

মাকড়ি নেড়ে ইাকড়ে বলে, আমায় তো কেঁটে উঁকছনি!

মুণ্ডু বোলা উলটোরুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,

বলছে দুলে, মিনসেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।



সজারং বলল, ‘দূর ছাই ! কি যে পড়ছে তার নেই ঠিক ।’

কুমির বলল, ‘তাহলে কোনটা, এইটা ?—দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে  
সম্বল বোকা ভোম্বল—এটাও নয় ? আচ্ছা তাহলে দাঁড়াও দেখছি—নিরুম নিশ্চিত  
রাতে, একাশে তেতালাতে, খালিখালি খিদে পায় কেন রে ?—কি বললে ? ওসব  
নয় ? তোমার গিন্ধীর নামে কবিতা ?—তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই  
তো—রাম ভজনের গিন্ধীটা, বাপরে যেন সিংহীটা ! বাসন নাড়ে ঝনারুন, কাপড়  
কাচে দমাদম—এটাও মিলছে না ? তা হলে নিশ্চয় এটা—

খুস্খুসে কাশি ঘৃষ্ঘুষে জর, ফুস্ফুসে ছাঁদা বুড়ো তুই ম্ৰ।

মাজ্ৰাতে ব্যাথা পাঁজ্ৰাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত !

সজারংটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, ‘হায়, হায় ! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল !  
কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না !’

গ্রাড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, সে হঠাতে বলে উঠল, ‘কোনটা শুনতে চাও ?  
সেই যে—বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু—সেইটে ?’

সজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘ইং-ইং, সেইটে, সেইটে !’

অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, ‘বাদুড় কি বলে ? হজুর, তাহলে বাদুড়-  
গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।’

কোলাব্যাঙ গাল-গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, ‘বাদুড়গোপাল হাজির ?’

সবাই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোথাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল,  
‘তাহলে হজুর, ওদের সকলের ফাঁসির ভকুম হোক।’

কুমির বলল, ‘তা কেন ? আমরা আপিল করব ?’

পঁচাচা চোখ বুজে বলল, ‘আপিল চলুক। সাক্ষী আনো।’

কুমির এদিক ওদিক তাকিয়ে হিজি বিজ্ বিজ্ কে জিগগেস করল, ‘সাক্ষী দিবি ?

চার আনা পয়সা পাবি।' পয়সার নামে হিজি বিজ্ৰ বিজ্ৰ তড়াক্ কৰে সাক্ষী দিতে  
উঠেই ফ্যাক্-ফ্যাক্ কৰে হেসে ফেলল।

শেয়াল বলল, 'হাসছ কেন ?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে,  
বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নৈল চামড়া আৱ মাথাৱ উপৱ লালকালিৱ  
ছাপ। উকিল যেই তাকে জিগগেস কৱেছে, তুমি আসামীকে চেন ? অমনি সে  
বলে উঠেছে, আজ্ঞে ইঁয়া, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নৈল চামড়া, মাথাৱ  
উপৱ লাল কালিৱ ছাপ—হোঃ হোঃ হোঃ হো—'

শেয়াল জিগগেস কৱল, 'তুমি সজারুকে চেন ?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'ইঁয়া, সজারু চিনি, কুমিৰ চিনি, সব চিনি। সজারু গৰ্তে  
থাকে, তাৱ গায়ে লম্বা-লম্বা কঁাটা, আৱ কুমিৰেৰ গায়ে চাকা-চাকা টিপিৰ মতো,

তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।' বলতেই ব্যাকরণ শিং ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে  
উঠল।

আমি বললাম, 'আবার কি হলো ?'

ছাগল বলল, 'আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি  
আধখানা মরে গেল।'

আমি বললাম, 'গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।'

শেয়াল জিগগেস করল, 'তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জান ?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'তা আর জানি নে ? একজন নালিশ করে তার একজন  
উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসাগী,  
তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দৃশ্যজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন  
জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়।'

পঁয়াচা বলল, ‘কঙ্কনো আমি ঘুমোছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ  
বুজে আছি।’

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, ‘আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সকলেরই চোখে  
ব্যারাম।’ বলেই সে ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, ‘আবার কি হলো?’

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, ‘একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ  
করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎ-  
পন্নতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু—কিন্তু যেই তার বাঢ়ির নাম  
দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাঢ়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ  
হোঃ হোঃ হো—’

শেয়াল বলল, ‘বটে? তোমার নাম কি শুনি?’

সে বলল, ‘এখন আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্।’

শেয়াল বলল, ‘নামের আবার এখন-তখন কি?’

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, ‘তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে আলু-  
নারকোল আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে রামতাড়ু।’

শেয়াল ‘বলল, ‘নিবাস কোথায়?’

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, ‘কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে  
গিয়েছে।’ অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উধো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,  
‘তাহলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।’

উধো বলল, ‘দেশে গেলেই লোকেরা সব হ্স-হ্স করে মরে যায়।’

বুধো বলল, ‘হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।’

শেয়াল বলল, ‘আঃ, সবাই ঘিলে কথা বল না, ভারি গোলমাল হয়।’

ଶୁନେ ଉଧୋ ବୁଧୋକେ ବଲଲ, ‘ଫେର ସବାଇ ମିଳେ କଥା ବଲବି ତୋ ତୋକେ ମାରତେ-  
ମାରତେ ସାବାଡ଼ କରେ ଫେଲବ ।’ ବୁଧୋ ବଲଲ, ‘ଆବାର ଯଦି ଗୋଲମାଲ କରିସ ତାହଲେ  
ତୋକେ ଧରେ ଏକେବାରେ ପୋଟିଲା-ପେଟା କରେ ଦେବ ।’

ଶେଯାଲ ବଲଲ, ‘ହଜୁର, ଏଇ ସବ ପାଗଳ ଆର ଆହାସ୍କକ, ଏଦେର ସାଙ୍କୀର କୋନେ  
ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ।’

ଶୁନେ କୁମିର ରେଗେ ଲ୍ୟାଜ ଆଛଡ଼ିଯେ ବଲଲ, ‘କେ ବଲଲ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ? ଦସ୍ତରମତୋ ଚାର  
ଆନା ପରସା ଖରଚ କରେ ସାଙ୍କୀ ଦେଓଯାନେ ହଚ୍ଛେ ।’ ବଲେଇ ସେ ତକ୍ଷଣି ଠକ୍ଠକ୍ କରେ  
ଷୋଲଟା ପରସା ଗୁଣେ ହିଜି ବିଜ、ବିଜେର ହାତେ ଦିରେ ଦିଲ ।

ଅମନି କେ ଯେନ ଓପର ଥିଲେ ଉଠିଲ, ‘୧ନଂ ସାଙ୍କୀ, ନଗଦ ହିସାବ, ମୂଲ୍ୟ ଚାର ଆନା ।’  
ଚେଯେ ଦେଖିଲାମ କାକେଶ୍ଵର ବସେ-ବସେ ହିସେବ ଲିଖିଛେ ।

ଶେଯାଲ ଆବାର ଜିଗଗେସ କରଲ, ‘ତୁମି ଏ ବିଷୟେ ଆର କିଛୁ ଜାନୋ କିନ୍ତା ?’

ହିଜି ବିଜ、ବିଜ、ଖାନିକ ଭେବେ ବଲଲ, ‘ଶେଯାଲେର ବିଷୟେ ଏକଟା ଗାନ ଆଛେ, ସେହିଟା ଜାନି ।’

ଶେଯାଲ ବଲଲ, ‘କି’ଗାନ ଶୁଣି ?’

ହିଜି ବିଜ、ବିଜ、ସ୍ଵର କରେ ବଲତେ ଲାଗଲ, ‘ଆୟ, ଆୟ, ଶେଯାଲେ ବେଣୁନ ଥାଯ, ତାରା ତେଲ ଆର ଝୁନ କୋଥାଯ ପାଯ—’

ବଲତେଇ ଶେଯାଲ ଭୟାନକ ବ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଉଠିଲ, ‘ଥାକ୍-ଥାକ୍, ମେ ଅନ୍ୟ ଶେଯାଲେର କଥା, ତୋମାର ସାକ୍ଷୀ ଦେଓଯା ଶେଷ ହୁଏ ଗିଯେଛେ ।’

ଏଦିକେ ହୁଯେଛେ କି, ସାକ୍ଷୀରା ପଯ୍ୟଦା ପାଞ୍ଚେ ଦେଖେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଜଣ୍ଯ ଭୟାନକ ହଡ଼ୋହଡ଼ି ଲେଗେ ଗିଯେଛେ । ସବାଇ ମିଳେ ଠେଲାଠେଲି କରିଛେ, ଏମନ ସମୟ ହଠାତ ଦେଖି କାକେଶ୍ଵର ବୁପ କରେ ଗାଛ ଥେକେ ନେମେ ଏସେ ସାକ୍ଷୀର ଜାଯଗାଯ ବସେ ସାକ୍ଷୀ ଦିତେ ଆରଣ୍ୟ କରିଛେ । କେତେ କିଛୁ ଜିଗଗେସ କରିବାର ଆଗେଇ ମେ ବଲତେ ଆରଣ୍ୟ କରିଲ,

‘শ্রীশ্রীভূশশিকাগায় নমঃ । শ্রীকাকেশ্বর কুচ্কুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি ।

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচুরা পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য—’

শেয়াল বলল, ‘বাজে কথা বল না, যা জিগগেস করছি তার জবাব দাও । কি নাম  
তোমার ?’

কাক বলল, ‘কি আপদ ! তাই তো বলছিলাম—শ্রীকাকেশ্বর কুচ্কুচে ।’

শেয়াল বলল, ‘নিবাস কোথায় ?’

কাক বলল, ‘বললাম যে কাগেয়াপটি ।’

শেয়াল বলল, ‘সে এখান থেকে কতদূর ?’

কাক বলল, ‘তা বলা ভারি শক্ত । ঘণ্টা হিসেবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ  
পয়সা, নগদ দিলে দুই পয়সা কম । যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন  
আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা ।’

শেয়াল বলল, ‘আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিগগেস করি, তোমার বাড়ি  
যাবার পথটা চেন তো?’

কাক বলল, ‘তা আর চিনিনে? এইতো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।’

শেয়াল বলল, ‘এ-পথ কতদূর গিয়েছে?’

কাক বলল, ‘পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি  
আবার এদিক ওদিক চরে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙ্গে হাওয়া খেতে যায়?’

শেয়াল বলল, ‘তুমি তো ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ,  
মোকদ্দমার কথা কি জান?’

কাক বলল, ‘খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে-বসে হিসেব করল কে? যা কিছু জানতে  
চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে  
কচুরি। কচুরি চার প্রকার—হিঙ্গে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা!

খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুটকুট করে, কিন্তু কাগেদের করে না।  
তারপর একজন সাঙ্কী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার  
কানের চামড়া নীল হয়ে গেল—তাকে বলে কালাজুর। তারপর একজন লোক ছিল  
সে সকলের নামকরণ করত—শেয়ালকে বলতো তেলচোর, কুমিরকে বলতো  
অষ্টাবক্র, পঁঢ়াকে বলতো বিভীষণ—' বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক  
গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাতে খেপে গিয়ে টপ্প করে কোলাব্যাঙ্কে খেয়ে  
ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্কিচ্কিচ্কিচ করে ভয়ানক চ্যাচাতে লাগল,  
শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হৃস্ত-হৃস্ত করে কাকেশৰ কুচকুচেকে তাড়াতে লাগল।  
পঁঢ়া গন্তীর হয়ে বলল, 'সবাই চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' এই বলেই  
সে একটা কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হকুম করল, 'যা বলছি লিখে নাও : মান  
হানির মোকদ্দমা, চরিষ নম্বৰ। ফরিয়াদী—সজারু। আসামী—দাঁড়াও। আসামী কৈ ?'

তখন সবাই বলল, ‘ঁ যা ! আসামী তো কেউ নেই।’ তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে গ্রাড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। গ্রাড়াটা বোঁকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি প্রয়সা পাবে, তাই ‘সে কোনো আপত্তি করল না।

হ্রস্ব হল—গ্রাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এ-রকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ ‘ব্যাকরণ শিং’ বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক টুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামাৰ মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধৰে বলছেন, ‘ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে-পড়ে ঘুমোনো হচ্ছে ?’

আমি তো অবাক ! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু, তোমরা

বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রূমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রূমাল  
নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে গোঁফে তা দিছিল, হঠাৎ আমায়  
দেখতে পেয়েই খচ্মচ্চ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের  
পিছন থেকে একটা ছাগল ব্যাক করে ডেকে উঠল।

আমি বড়মামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, ‘যা, যা, কত-  
গুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গণ্প করতে এসেছে।’ মাঝুষের বয়স হলে এমন  
হোতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা  
এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।



